তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং গ্রামবাংলা

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং গ্রামবাংলা

আমার গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং গ্রামবাংলা।' এই অধ্যায়টি আমার গবেষণাপত্রের বিষয়ের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। আমার গবেষণাপত্রে আমি যেহেতু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বদলে যাওয়া গ্রামজীবনের উপর আলোকপাত করেছি সেহেতু আমি একই সঙ্গো এই বিবর্তনের পশ্চাতে দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তব প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার প্রয়োজন বলে মনে করেছি। কারণ সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তাই সাহিত্যের পাতায় স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামবাংলার সামাজিক অবস্থার, অর্থনৈতিক অবস্থার পালাবদলের কথা বলতে গিয়ে আমি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিভিন্ন নীতি, পঞ্চায়েত, ভূমিব্যবস্থা প্রভৃতির অভিঘাতে বদলে যাওয়া গ্রামের কথা তুলে ধরেছি।

ভারতে গ্রামোন্নয়নে প্রশাসনের কাঠামোগত বিবর্তনের ইতিহাস পুরানো, প্রায় শতাব্দীকাল ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও রূপরেখা গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালেই গ্রামীণ উন্নয়নের উপর প্রকৃত গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে সুসংহত প্রশাসনিক পরিকাঠামোর সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে লক্ষে উপনীত হওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক উপায়ে দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিপূরক হিসেবে সমস্ত নাগরিকদের জন্য ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে এক সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দ্বিমুখী উদ্দেশ্যে দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের খসড়া তৈরি করা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসরণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে দেশের আর্থিক সম্পদের সুষম বণ্টনের উদ্দেশ্যে ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। ভারতের প্রতিটি পরিকল্পনার সময়কাল আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচ বছর। তাই ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' নামে পরিচিত।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বর্তমানের সম্ভাব্য উপাদানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাকে পরিকল্পনা বলে। নির্দিষ্ট কিছু

বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই সাধারণত কোন দেশের সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে তোলে। ভারতের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি হল—

দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কেন্দ্রীয় সম্পদের কাম্য ব্যবহার, মূলধন গঠন, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প প্রসারে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন, অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদ সংরক্ষণ।

১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গড়ে ওঠার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হয় ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এবার দেখা যাক ১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে ক'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যেই বা কী!

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-১৯৫৬)

উদ্দেশ্য ঃ

(১) যুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে অর্থনীতিতে যে অসমতা দেখা দিয়েছিল তা সংশোধন করা।

(২) উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি।

স্বাধীনতার পর ভারতীয় অর্থনীতি মূলত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল খাদ্য সমস্যা, শরণার্থী সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি এগুলি সমাধানের লক্ষ্যেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার সাফল্য ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক। জাতীয় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১১ শতাংশ অতিক্রম করে ১৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়—কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল প্রায় ১৯ শতাংশ—এই আশাতীত বৃদ্ধির ফলে খাদ্য সমস্যা রোধ করা সম্ভব হয়েছিল, তার ফলে মুদ্রাস্ফীতিও হ্রাস পেয়েছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-১৯৬১)

উদ্দেশ্য ঃ

(১) জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা।

(২) বুনিয়াদী এবং ভারী শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে দ্রুত শিল্পায়ন।

(৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(৪) আয় ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় কৃষিক্ষেত্রের ব্যর্থতার দরুণ খাদ্যশস্যের দাম প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই সময়ে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ায় ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শেষ হয় ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১-১৯৬৬)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল ভারতীয় অর্থনীতির প্রায় সম্পূর্ণই কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীলতা—এই ব্যর্থতার থেকে শিক্ষা নিয়ে ঠিক হয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—

(১) পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক ৫% হারে বা তার কিছু বেশি হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এবং পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোতে যাতে ওই হার বজায় থাকে সেভাবে বিনিয়োগ করা।

(২) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং শিল্প ও রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার মতো প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৩) ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প যন্ত্রপাতি, শক্তি ও জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাতে আগামী ১০ বছর দেশীয় সম্পদের সাহায্যেই শিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(৪) দেশের মানবিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার অধিকতর সম্প্রসারণ।

(৫) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুফল বণ্টন।

তৃতীয়ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ হয়েছিল। তার কারণ ছিল চীন (১৯৬২) ও পাকিস্তানের (১৯৬৫) ভারত আক্রমণ। ফলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, প্রতিকূল অবহাওয়ার জন্য কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি, অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার চরম ঘাটতি।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৯-১৯৭৪)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর তিন বছর আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেওয়া হয় না, তাই ৬৬ পর ৬৯ সালে পুনরায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়।

উদ্দেশ্য ঃ

(১) স্থায়িত্ব বজায় রেখে উন্নয়ন ও জাতীয় স্বয়ম্ভরতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

(২) পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক ৫.৭ শতাংশ হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি।

(৩) কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ৫.৫ শতাংশ এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা

(৪) কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর ও সাধারণ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

(৫) বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করা।

(৬) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা প্রসারিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

(৭) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় কৃষি, শিল্প, সামাজিক পরিষেবা প্রায় সকল ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যর্থতার মূলে ছিল তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৪-১৯৭৮)

উদ্দেশ্য ঃ

(১) দারিদ্র্য দূর করা।

(২) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন।

এই সংকল্প অপূর্ণই থেকে যায়। যদিও দারিদ্র্য দূরীকরণে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল তা যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। আগেও উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিন্তু সামাজিক ন্যায় বিচারের দিকটি উপেক্ষিত ছিল; আর্থিক স্বনির্ভরতার উপরও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু

অপরিশোধিত তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এই পরিকল্পনাকে সফল হতে দেয়নি।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আলোচনার পূর্বে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পঞ্চম পরিকল্পনাটি তার নির্দিষ্ট মেয়াদের এক বছর পূর্বেই স্থগিত হয়ে যায়। যার প্রধান কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল। ১৯৭৭ সালে জনতা দল ক্ষমতায় আসার পর নতুনভাবে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত জনতা দল নবগঠিত পরিকল্পনার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে, কিন্তু ১৯৮০তে জনতা লোকদলের পতন ঘটে এবং কংগ্রেস সরকার নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গঠন করে যার মেয়াদ হয় ১৯৮০-১৯৮৫। এটিই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপে পরিচিত।

উদ্দেশ্য ঃ

(১) অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতি সাধন করা।

(২) অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য অর্থব্যবস্থার আধুনিকীকরণের প্রয়াস সুদৃঢ় করা।

(৩) শক্তির দেশীয় উৎসগুলির দ্রুত উন্নয়ন এবং শক্তি সংরক্ষণ ও শক্তি ব্যবহারের দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

(৪) ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্মত করা।

(৫) দারিদ্র্য ও বেকারত্বের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস করা।

(৬) আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করার জন্য সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর অনুকূলে সরকারি নীতি ও পুনর্বণ্টনের প্রয়াসকে শক্তিশালী করা।

(৭) আঞ্চলিক বৈষম্য দ্রুত হ্রাস করা এবং প্রযুক্তির সুফল প্রসারিত করা।

(৮) স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের নীতিকে সম্প্রসারিত করা।

(৯) উদ্ভিদ, প্রাণী ও যাবতীয় পরিবেশগত সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নতির মাধ্যমে উন্নয়নের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

(১০) শিক্ষা, যোগাযোগ এবং প্রতিষ্ঠানগত কৌশলের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গো বলা যায় যে, কৃষি ও সেবাক্ষেত্রের অগ্রগতি হলেও শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতি খুবই নৈরাশ্যজনক। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেলেও কর্মসংস্থান এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাছাড়া লেনদেন ঘাটতির সমস্যাও আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-১৯৯০)

উদ্দেশ্য ঃ

(১) দারিদ্র্য দূরীকরণ।

(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(৩) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

(৪) মানবিক সম্পদের বিকাশ ও সদ্ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫ শতাংশ বেশী হলেও কৃষিক্ষেত্রে তেমনভাবে উন্নতি হয় না। এই পরিকল্পনার সবথেকে বড় সমস্যার জায়গা হল লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাব। যার ফল হয়েছিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে প্রচুর ঋণগ্রস্ততা, শিক্ষিত বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপে ভারতের অর্থনীতিতে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯২-১৯৯৭)

সপ্তম পরিকল্পনার শেষে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং ঘন-ঘন সরকারের পরিবর্তনের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯০ সালের পরিবর্তে ১৯৯২ থেকে শুরু হয়।

উদ্দেশ্য ঃ

(১) বিংশ শতাব্দীর শেষে পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

(২) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা।

(৩) ১৫-৩৫ বছর পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তির নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া।

(৪) সমস্ত গ্রাম ও সকল জনসাধারণের জন্য পরিচ্ছন্ন পানীয় জল সরবরাহ করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

(৫) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও রপ্তানিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য কৃষির উন্নয়ন এবং উৎপাদন কাঠামোর বৈচিত্র্যসাধন।

(৬) উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান ধারাকে বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর (শক্তি, পরিবহন, যোগাযোগ, সেচ) ভিত শক্তিশালী করা।

এই পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই পরিকল্পনাকালে বাজার অর্থনীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারীকরণ শুরু হয়েছে। শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তা জনসাধারণ কতটা ভোগ করেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রকৃতপক্ষে বেকার সমস্যার তীব্রতা ও দারিদ্র্যের সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে দেখা দেয়।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০১)

উদ্দেশ্য ঃ

(১) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কৃষি এবং গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ।

(২) মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা।

(৩) সকলের জন্য বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি সুনিশ্চিত করা।

(৪) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সকলের কাছে নিরাপদ পানীয় জল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যের সুযোগ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বাসস্থান ও যোগাযোগের ন্যূনতম পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ।

(৬) সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা।

(৭) সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের কাজে নারী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

(৮) পঞ্চায়েত রাজ, সমবায় ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়তা করা।

(৯) স্বনির্ভর প্রয়াসকে শক্তিশালী করা।

এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এতদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী ক্ষেত্র এবং বাজার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয় সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্র একে অপরের পরিপূরক। সেইজন্য এই পরিকল্পনায় তিনটি ক্ষেত্রে সরকারী অনুপ্রবেশের কথা বলা হয়—

(ক) মানুষের জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি।

(খ) উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

(গ) আঞ্চলিক সুষম উন্নয়ন।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নের সঙ্গে ন্যায় বিচারের উপর জোর দেওয়া হয় যা নিঃসন্দেহে মহান উদ্দেশ্য, তবুও একথা বলতে হয় যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন কোনো ক্ষেত্রেই এই পরিকল্পনা কাম্য উৎপাদনের স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০২-২০০৭)

উদ্দেশ্য ঃ

(১) পরিকল্পনাকালে বার্ষিক ৮% হারে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (G.D.P.) বৃদ্ধি।

(২) স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির নীতি গ্রহণ করা হয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য সতর্কতামূলক বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে—

(ক) ২০০৭ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২০% নামিয়ে আনা।

(খ) সমস্ত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষালাভের চেষ্টা।

(গ) শিশুমৃত্যু এবং গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর হার হ্রাস।

(ঘ) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখ্য।

এই পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গো বলা হয় যে, স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য দেখিয়ে ২০০৫-২০০৬ সালে ৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং স্থূল অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনের বার্ষিক ৩২.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, এই বৃদ্ধির সুফল কিন্তু দরিদ্র এবং দুর্বল শ্রেণীর জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে বেকারত্ব, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা পরিকল্পনার লক্ষ্যের বিরোধী। কৃষির ব্যর্থতাও এই পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০৭-২০১২)

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া Towards faster and more inclusive growth শিরোনামে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে মঞ্জুর করা হয় এবং একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিস্তারিত খসড়া ২০০৭ সালে জাতীয় পরিষদে অনুমোদিত হয়।

উদ্দেশ্য ঃ

(১) দারিদ্র্য হ্রাস এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(২) দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(৩) বিশেষ করে দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা সৃষ্টি।

(৪) শিক্ষা এবং দক্ষতার উন্নতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

(৫) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(৬) লিঙ্গা বৈষম্য হ্রাস।

(৭) পরিবেশগত উন্নতি।

(৮) প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধি।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কমিশন সর্বব্যাপী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও বাস্তবে দেখা যায়, উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাচ্ছে কারণ উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকাংশ সুফল মালিকপক্ষ বা বৃহত্তর ব্যবসায়ী সংস্থা আত্মসাৎ করছে। এছাড়া এই পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষিজাত দ্রব্যের দামের স্থিতিশীলতার জন্য তহবিল সৃষ্টি, আমদানিকৃত কৃষিজাত দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের সুরক্ষা ইত্যাদির বিষয় উপেক্ষিত। সুতরাং এই পরিকল্পনাকে সেই অর্থে সফল বলা যায় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতার পর থেকে দেশীয় সরকার দেশের আর্থিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, নাগরিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। এর ফলে সমগ্র দেশের শহরে এবং গ্রামাঞ্চলের জনজীবনে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নগর জীবনের বদল সকলের দৃষ্টিগোচর হলেও গ্রামজীবনের পরিবর্তন ঘটেছে বহুল পরিমাণে, যার পশ্চাতে আর্থ-সামাজিক কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দেশীয় সরকারের ভূমিকা আছে। আমার গবেষণাপত্রের বিষয় যেহেতু "সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তরকালে পরিবর্তিত গ্রামজীবন", সেহেতু উপন্যাসে গ্রামবাংলার পরিবর্তনের কথা বলার আগে আমি গ্রামবাংলার পরিবর্তনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে করেছি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রচলিত ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়নি, এমন কি অল্প সময়ে সংস্কার করাও সম্ভবপর ছিল না। একথা স্পষ্ট যেদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রিটিশ শাসনবর্গের কোনও আগ্রহ ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত করা। প্রাক্-স্বাধীনতাকালের প্রশাসন ছিল মূলত নিয়ন্ত্রণমূলক, যার লক্ষ্য ছিল অসংগঠিত গ্রামীণ জনসমষ্টিকে শোষণের স্বার্থে শাসন করা। সুতরাং ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ শোষিত হয়েছে, শাসক ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা পাই। তাই স্বাধীনতার পরেও গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে, প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠনের সাহায্যে প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে ফারাক কমিয়ে, দেশের উন্নয়ন, প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার কোনও ইচ্ছা দেশীয় নেতৃত্বের ছিল না। এমনকি সংবিধান প্রণেতাগণের মধ্যেও এ ধরনের কোনও অভিপ্রায় তেমনভাবে দেখা যায়নি। গণপরিষদে সংবিধান অনুমোদিত হওয়ার সময় তীব্র সমালোচনার মুখে সংবিধান খসড়া কমিটি, শান্তারাম আনীত সংশোধনী গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ৪০ নং অনুচ্ছেদে গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করার দায়িত্ব রাজ্যসমূহের উপর অর্পণ করা হয়।

মূলত বলবন্ত মেহেতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্বাধীনতার পর দ্রুত আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করে। এরপর ১৯৫৩ সালে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবা শুরু হয়। এই দুটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির বৈচিত্র্য সাধন এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের দ্রুত সম্প্রসারণ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, গ্রামীণ জনসমষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি সাধনই এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল। যদিও

উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই কর্মসূচি কোনো গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। অপরদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হলেও পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে গ্রামীণ স্তরে গণ উদ্যোগ ও জন অংশগ্রহণ অপরিহার্য শর্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে ১৬ই জানুয়ারী বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটি গঠন করা হয় এবং ওই বছরই ২৪শে নভেম্বর সরকারের সামনে মেহেতা কমিটির প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

মেহেতা কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবা জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে খুব একটা সফল হয়নি। গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপরের স্তরে খুব কম সংখ্যক স্থানীয় সংস্থাই এই কাজে আগ্রহ দেখিয়েছিল। সাময়িক ভিত্তিতে সংস্থাগুলি গঠিত হয়েছিল মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা। এইগুলি মূলত উপদেষ্টা পর্ষদ হিসাবে কাজ করত। গ্রামীণ সংস্থাগুলি গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য অনুরপ্রেরণা বা শক্তি জোগাবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের পরিচয় দেখাতে পারেনি। মেহেতা কমিটির প্রতিবেদন আরও বলা হয়েছে যে—

> "স্থানীয় এলাকার প্রয়োজন এবং আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যাতে স্থানীয় উন্নয়নে অর্থ ব্যয় হয় তা দেখার জন্য এবং যথেষ্ট ক্ষমতা নিয়ে একাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করবার দায়িত্ব অর্পণের জন্য এক দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করা পর্যন্ত উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা কখনও স্থানীয় জনগণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে এবং তাদের উদ্যোগী করে তুলতে পারব না।" [১]

বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটির এই ভাবনা থেকে স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েতি রাজ গঠনের নতুন উদ্যম শুরু হয়। আমাদের মতন বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে একই ধাঁচের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন হতে পারে, এই ভেবে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে রাজ্যগুলোকে নিজেদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে পঞ্চায়েত গঠনের স্বাধীনতা দেওয়ার কথা কমিটি বলেছিল।

কিন্তু বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটির রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কমিটি গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পঞ্চায়েত রাজ্য ব্যবস্থাকে দেখলেও বাস্তবে কমিটি চেয়েছিল পঞ্চায়েতকে সমষ্টি উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে। অর্থাৎ এই কমিটি পঞ্চায়েতকে স্থানীয় সরকারের একক হিসাবে বিবেচনা করেনি, বিবেচনা করেছিল গ্রামীণ উন্নয়ন এজেন্সি হিসেবে। বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটি সর্বোদয় নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলহীন পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলেছিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলহীন নির্বাচন ব্যবস্থা যে বাস্তবোচিত ছিল না, তা অল্প দিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল। দলহীন নির্বাচনের ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাশাপাশি জেলা পরিষদের গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের নীতি গ্রহণ করায় গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন শুরু হয় এবং প্রথম প্রজন্মের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে এই সময় থেকে অশোক মেহেতার কমিটির হাত ধরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়, যা পশ্চিমবাংলার জনজীবনেও এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত করে।

তবে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলার পটপরিবর্তনের কথা বলার পূর্বে দেশের সরকারের কিছু পরিকল্পনার কথা একান্তভাবে বলা দরকার যা গ্রামীণ ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে, নিঃসন্দেহে গ্রামবাংলাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর নজর দেওয়া হয়। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির এই যে পরিকল্পনা তার দুটি বৈশিষ্ট্য হল স্বনির্ভরতা এবং ভূমিসংস্কার করে জমি বণ্টন। প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-১৯৫৫) খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ২৬ শতাংশ যখন জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে ১৮ শতাংশ। ১৯৫১-১৯৭১ সালের মধ্যে মোট খাদ্য উৎপাদন ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ টন বেড়ে যায়। কিন্তু এর থেকে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, উদ্বৃত্ত ফসল সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়ে যেত। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তির প্রয়োগ হতে শুরু হয় খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য। এই প্রযুক্তি অনেক বেশি পুঁজিনির্ভর এবং বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই প্রযুক্তির মূল হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল বীজ। এই বীজ থেকে উচ্চফলনশীল ফসল পেতে গেল প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণ সার, জল এবং কীটনাশক পদার্থ। ভূমিসংস্কারের যে পরিকল্পনা আগে নেওয়া হয় তার পরিবর্তে পুঁজিনির্ভর প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হল। এই প্রযুক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি করল ঠিকই কিন্তু তার মূল্য দিতে হয়েছিল প্রচুর। কৃষিজমির সর্বনাশ ঘটেছিল এবং গরীব মানুষের বাঁচা হয়েছিল দুষ্কর। দু একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন গুজরাতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের চাষিরা তাদের কৃষিজমির ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে প্রকৃতিকে বুঝে যুগ যুগ ধরে জোয়ার বাজরার মত শস্য চাষ করত, কারণ ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। বিশেষত গরীব মানুষেরা ঐ সব করেই জীবন ধারণ করত। ১৯৬১ এর দশকে সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তির উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রয়োগ যখন ঐ অঞ্চলে হল তখন নলকূপ বসান শুরু হল মাটির নীচে থেকে জল তুলে চাষ করার জন্য। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গিয়ে পুকুর ও কুয়ো শুকিয়ে গেল। জলের স্তর যত নেমে গেল তত পুঁজি নিয়োগ করে গভীরতর নলকূপ লাগান হতে লাগল। গরীব মানুষেরা, যাদের পুঁজি নেই তারা জলের সংস্থান হারিয়ে বাস্তুহারায় পরিণত হল এবং গুজরাত বা অন্যান্য প্রদেশে ঝুপড়িবাসী বা ফুটপাতবাসী হল। জলের স্তর নেমে গিয়ে

সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে গিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ হেক্টর জমিকে লবণাক্ত করে বন্ধ্যা করে দিয়েছে। আধুনিক উন্নত অর্থনীতি বা প্রযুক্তি লাভের অঙ্কই বোঝে কিন্তু তার পশ্চাতের জীবনের ক্ষতি তার চোখে বড় একটা পড়ে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ আমাদের এই পশ্চিমবাংলা। সবুজ বিপ্লব খাদ্যোৎপাদন বাড়িয়েছে যখন বলি, তখন খাদ্যশস্যের দানার উৎপাদনকেই বুঝি। আগে একটি জমির উৎপাদিকাশক্তি বলতে শুধু দানার উৎপাদনই ছিল না। সেই জমিতে যে কাঁকড়া, শামুক, গুগলি, মাছ এবং নানারকমের উদ্ভিদ যা গরীব মানুষের খাদ্য ছিল তা ধীরে ধীরে কীটনাশকের ফলে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পুরানো ধানে যে খড় হত তা গরুমহিষের খাদ্য ছিল, ঘরছাওয়াতে ব্যবহৃত হত। উচ্চফলনশীল ধানের খড় গরু খায় না, ঘর ছাইলে এক বছরও যায় না। পচে যায়। জমিতে যে জীববৈচিত্র ছিল যেমন কেঁচো, নানারকমের মাকড়সা ইত্যাদি তা ধ্বংস হয়ে গেল। একটা পেঁচা দিনে তিন-চারটে ইঁদুর খায় সেই পেঁচা প্রায় উধাও হয়ে গেল। অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নীতি গ্রহণ করার কথা ভাবলেও দেশীয় সরকারের নীতি সকলের হিত সাধন করেনি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস 'তৃণভূমি'তে আমরা এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র দেখি। যে তৃণভূমি একসময় রাখালদের অবাধ চারণভূমি ছিল, যেখানে মাঠচরানী মেয়েরা নিত্যদিনের বাঁচার রসদ খুঁজে পেত, সেখানেই একদিন এলাকার জোতদারদের কুদৃষ্টি পড়ে, বাইরে থেকে আগত পুঁজিপতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা বাঁধ দিয়ে বেঁধে ফেলতে চায় স্বাধীন তৃণভূমি, উৎখাত করতে চায় আসল ভূমিপুত্রদের। অস্তিত্বরক্ষার আদিম তাগিদে শুরু হয় লড়াই এবং বদল ঘটে পরিস্থিতির। সময়টা ১৯৬৭ সাল। পশ্চিমবাংলার রাজনীতির এক উত্তেজক সময়। নানা রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচলিত নীতি, তার বিরুদ্ধে গ্রামীণ মানুষের বিদ্রোহ, রাজনৈতিক সংঘর্ষে বদলে যায় অবস্থা। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে সরকারের পরিবর্তন ঘটে, জনতাদল ক্ষমতায় আসীন হয় এবং পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতেও হস্তান্তর ঘটে। এটা নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ।

এ রাজ্যে কংগ্রেস শাসনকালে গ্রামীণ অর্থনীতি নিঃসন্দেহে স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু গ্রামের বৃহৎ কৃষক শ্রেণীর অধীনে জমি থাকায় গ্রামের কৃষির বিকাশ তেমনভাবে ঘটেনি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ছিল ভূমিহীন, খেতমজুর যাদের বছরের অধিকাংশ সময় কর্মহীনতায় কাটাতে হত। সেচের অভাবে কৃষিজমি ছিল একফসলি। স্বভাবতই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি কোন কোন বছর সেভাবে হত না। গ্রামের ৬০ ভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, কর্মহীনতা, বিদ্যুতের অভাবে জর্জরিত গ্রামগুলোয় ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল গ্রামের বৃহৎ কৃষক শ্রেণী।

এই রকম অবস্থায় নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে গ্রামোন্নয়নের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে। সরকার গুরুত্ব দেয় ভূমিসংস্কার সাধনের মাধ্যমে গ্রামের কাঠামোগত পরিবর্তনে। রাজ্য সরকারের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হল সরকার ও পঞ্চায়েতের কাজে জনগণের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে জনগণের স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। গ্রামোন্নয়নের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়নের নীতিতে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতে যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির দায়িত্ব বহু রাজ্যে সরকারি আধিকারিকদের হাতে থাকে, সেখানে পশ্চিমবাংলায় এই কর্মসূচির দায়িত্বে থাকে গ্রামপঞ্চায়েত। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রামের আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখেই দরিদ্রদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের কাছে গ্রামোন্নয়নের প্রাথমিক শর্তই ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। তাই গ্রামোন্নয়নের প্রথম স্তরেই তারা ভূমিসংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। আর এই কর্মসূচি রূপায়ণে প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী হল গ্রাম-পঞ্চায়েত। গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিকল্পনা মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তার সফল প্রয়োগ ঘটেছিল রাজ্যসরকারের কর্মসূচির ফলে।

এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ছিল—

- জমির উর্ধ্বসীমা আইন তৈরি করা বা সিলিং নির্ধারণ করা।
- উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিত করা।
- উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা।
- পাট্টা প্রদান করা।
- ভাগচাষির নাম অন্তর্ভুক্ত করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

ভূমিসংস্কারের এই প্রতিটি কর্মসূচিতে পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৭৭-৭৮ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে রাজ্য সরকার প্রায় ১৩ লক্ষ একরেরও বেশি সিলিং বহির্ভূত কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেছে। পঞ্চায়েতগুলি জোতদারদের বেনামী জমি খুঁজে বার করতে সরকারি প্রশাসনকে সাহায্য করেছে। এই অধিগৃহীত জমি ২৭ লক্ষেরও বেশি গরিব চাষির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই ভূমিহীন গরিব চাষিদের খুঁজে বার করতে পঞ্চায়েতই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত এদের পাট্টা দিয়েছে। এই পাট্টাদাররা

যাতে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে পারে সেই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমিসংস্কার কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যতম বৈপ্লবিক কর্মসূচি। বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষিত করতে যে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল তাকে অপারেশন বর্গা নাম দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৭ লক্ষ বর্গাদার বা ভাগচাষি নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ জমির মালিকরা আর নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ভাগচাষিদের উৎখাত করতে পারে না, ভাগচাষিরা এখন নিঃসন্দেহে মালিকের দয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। সামগ্রিকভাবে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ভূমিসংস্কারের ফলস্বরূপ ভূমিহীন কৃষকরা জমি পেয়েছেন। বর্তমানে এ রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির সংখ্যা হল যথাক্রমে ১৬.৮১% এবং ৭৬.৪২%। এই ৯৩.২৩% ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির হাতে রয়েছে রাজ্যের ৭১.৯৯% কৃষিযোগ্য জমি। স্বাধীনতার পরে সারা দেশে ভূমিসংস্কারে উপকৃত পরিবারের ৫৪% হল পশ্চিমবঙ্গে।

ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের যে ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই রাজ্যে কৃষি উন্নয়ন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সমবণ্টনের বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কৃষি ক্ষেত্র থেকে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে মাথাপিছু গড় আয়। ১৯৯৫ সালে কৃষি মজুরের মজুরি ছিল ৩১.৪৭ টাকা। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ টাকা হয়েছে। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের চাষি আজ আর খালি গায়ে খালি পায়ে থাকে না। তাদের চাহিদা নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্য থেকে বের হয়ে শৌখিনতায় পর্যবসিত। গ্রামপঞ্চায়েতের উদ্যোগে নির্মিত রাস্তাঘাট, শহরের সঙ্গে গ্রামকে জুড়ে দিয়েছে ফলে স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে জীবনযাত্রার মান।

অপারেশন বর্গা ও ভূমিসংস্কারের ফলে আমাদের রাজ্যে গ্রামোন্নয়নের প্রক্রিয়াতে যে সাফল্য এসেছে তাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচের যথাযথ সহায়তায় শস্য নিবিড়তা বেড়েছে। অর্থাৎ এক-দুই ফসলি জমি তিনফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি মৎস্য চাষ, কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিল্পের বিকাশ ও উৎপাদনের বাড়তি মূল্য সৃষ্টির ফলে একদিকে যেমন কাজের সুযোগ বেড়েছে অনদিকে তেমনি বাড়তি আয়ের পথ তৈরি হয়েছে। কিন্তু উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রথাগত শিল্প প্রতিষ্ঠান একে একে বন্ধ হয়ে পড়ায় বেড়েছে বেকার সমস্যা। গ্রামের এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও অধিকাংশ প্রকল্পগুলো কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের অর্থে পরিচালিত।

৭০-এর দশকের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান প্রদানের উপর জোর দিয়েছিল, এক্ষেত্রে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গোর পঞ্চায়েতগুলি কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে গ্রামের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন (যেমন রাস্ত, সেতু, বাঁধ) ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে একদিকে গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছিলেন, অন্যদিকে গ্রামের সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির কাজে গণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের বিনিময়ে আসে জাতীয় গ্রীমণ রোজগার প্রকল্প (NREP)। এই দুটি প্রকল্প পরে একসাথে মিলিত হয়ে তৈরি হয় 'জওহর রোজগার যোজনা'। এই প্রকল্পে প্রতিদিন পাঁচ কিলোগ্রাম করে খাদ্যশস্য এবং নগদ মজুরি দেওয়া হয়। যার ৭৫ ভাগ টাকা দেয় কেন্দ্র এবং ২০ ভাগ দেয় রাজ্য। এই সমস্ত প্রকল্প নিঃসন্দেহে গ্রামবাংলার জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের একাধিক উপন্যাস যেমন—'নিশিলতা', 'জনপদ জনপথ' 'নদীর মতন', 'নির্জন গঙ্গা', 'নিলয় না জানি' প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রামজীবনের এই ক্রম পরিবর্তনের চিত্র ধরা পড়ে। আসলে সাহিত্যে সমাজের যে প্রতিফলন ঘটে সেটি আর একবার প্রমাণিত হয় বাস্তবের সঙ্গো সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের সাযুজ্য দেখে।

কর্মসংস্থান এর প্রয়োজনের নিমিত্তে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা পঞ্চায়েতের একটা বড় কৃতিত্ব, এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গো বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এবং সংস্থা ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যাঙ্ক, ও সমবায়কে সঙ্গো নিয়ে এটিকে একটি আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় এক লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ৬৫% SGSY প্রকল্পের অধীনে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠিগুলিতে ৯৬% মহিলা। এদের সদস্যসংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষের মতন। তৎকালীন রাজ্য সরকারের দাবী অনুযায়ী ২০০৮ এ মার্চ মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ নিযুক্ত হয়েছে।

গ্রাম সংসদকে কেন্দ্র করে স্বনির্ভর দলগুলি পঞ্চায়েতের সঙ্গো একত্রে মিলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ছাড়াও অন্য যে সমস্ত কাজ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- সমস্ত শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে যাওয়া।
- অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের পাঠানো ও দেখাশোনা করা।
- সমস্ত শিশু ও গর্ভবতী মাকে সব কটি টীকা দেওয়া।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য খাবার তৈরি করে দেওয়া।
- গ্রামে বীজ ভাণ্ডার ও শস্য গোলা তৈরি করা।

এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে—

- মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যারা স্বনির্ভর দল গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন।
- অধিকাংশ স্বনির্ভর দলগুলোর ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ঋণ ও আয় বাড়ানোর বিষয়ে দলের সদস্যদের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো।
- মহিলাদের স্বনির্ভর দলে যোগ দেবার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি।
- ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও প্রান্তিক চাষিরাই বেশি দলে আসছেন।

জীবনের মানেন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশ্চিমবঙ্গো পঞ্চায়েত সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযান পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে একটি নতুন আন্দোলন। রাজ্যের প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য পরিকাঠামোগত যে ব্যবস্থা রয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান সেই ব্যবস্থার অতিরিক্ত সহায়ক শক্তি। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের সব শিশুকে ২০০৩ সালের মধ্যে প্রথাগত বিদ্যালয়, বিকল্প বিদ্যালয় ও পরিপূরক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য।

সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ের গৃহ ও অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিপূরক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে পরিচালনা করা ইত্যাদি। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আজ গ্রামেও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ গড়ে উঠেছে এবং সেখানে নিয়মিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে।

গ্রাম-পঞ্চায়েত সম্পর্কে আর একটি কথা বলতেই হয় যে, রাজ্য সরকার প্রশাসনিক স্তরে সাধারণ মানুষের যোগদানকে নিশ্চিত করেছিল, বিশেষত মেয়েদের গ্রাম-পঞ্চায়েতে সক্রিয় যোগদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য যা প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত পঞ্চায়েতে দেখা যেত না।

সরকারি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ষাটের দশকে ১৯৬৮-৬৯ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গো গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং অঞ্চল পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬৯ এবং ১০৫ জন। অথচ এই সময় পঞ্চায়েতের এই দুটি স্তরে পুরুষদের উপস্থিতির হার ছিল ২,১৭,০৫০ এবং ৫৫,৬৬৯ জন।[২]

এই সময়কার পঞ্চায়েতের কাজে মহিলাদের অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে অনেক গবেষক যেখানে পর্দাপ্রথাকে দায়ী করেছেন, তেমনই অনেক গবেষক জন-অংশগ্রহণের নীতি ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপস্থিতিকে দায়ী করেছেন। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গা পঞ্চায়েতের উল্লিখিত দুটি আইনকে বাতিল করে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গা পঞ্চায়েত আইনে ত্রিস্তর-বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। যদিও ১৯৭৭ সালে সরকার পরিবর্তিত হওয়ার আগে এ রাজ্যে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণের পূর্বে মহিলা, তপশিলি, জাতি, উপজাতি মানুষদের থেকে দুজন করে মনোনয়ন করতে পারত পঞ্চায়েত। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে মনোনীত মহিলারা সাধারণত উচ্চজাতের গ্রামের প্রভাবশালী পরিবার থেকে উঠে আসতেন। পঞ্চায়েতে এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতে মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল ২% এর নীচে। এমনকি সেটা ১৯৭৭ সালের পরেও বজায় ছিল।

১৯৮৬-তে এল এম সিঙভি কমিটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের নতুন গৃহীত এই নীতি অনুসারে ১৯৯৩ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাঠামো আরও গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ৭১,১২০টি আসনের মধ্যে তপশিলি, জাতি-উপজাতিভুক্ত মহিলা সমেত মোট ২৪,৮৯৫ জন মহিলা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত হয়ে আসে।

পঞ্চায়েতের আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই গ্রামের অল্পশিক্ষিত, মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত, সাধারণ, তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং মহিলারা তাদের নিজ নিজ আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী স্থান করে নিতে পেরেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আসন সংরক্ষণ ছাড়া নির্বাচনে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পঞ্চায়েতের কাজে যুক্ত হওয়া মহিলাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন সংস্থা'র গবেষণা থেকে জানা যায় যে, পঞ্চায়েতের জন্য আসন সংরক্ষণকে গ্রামের মানুষ দু-হাত তুলে সমর্থন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে তৃণমূল স্তরে, গ্রামের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে, পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিরাট সংখ্যক মহিলাদের পঞ্চায়েতের কাজে অংশ গ্রহণের ফলে নারী ও শিশু বিকাশ, স্বাস্থ্য ও আবাসন প্রকল্পে মহিলারা যথেষ্ট সক্রিয়। মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যারা গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে, সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে, শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুমৃত্যুর হার রোধ করা, প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প, বার্ধক্য ও পেনশন প্রকল্পে, পালস্ পোলিও কর্মসূচি পালনে যে গতির সঞ্চার হয়েছে তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় সিরাজের 'নদীর মতন' উপন্যাসের কথা, যেখানে ধরিত্রী নামের এক সাধারণ মেয়ে হয়ে উঠেছে গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান, যার কর্মতৎপরতায় গ্রামের সকলে তাকে 'পঞ্চাত দিদি' বলে সম্বোধন করে।

তবে শুধু মহিলাদের সংরক্ষণ নয় পরিবর্তিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় একেবারে তৃণমূলস্তর থেকে উত্থিত নেতৃবৃন্দের অবস্থান বাস্তবিকই বদলে যাওয়া গ্রামবাংলার ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ষাটের দশকে রাজ্যে দলবিহীন পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় মূলত গ্রামের ধনী, মধ্যবিত্ত কৃষক এবং

শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ছিলেন পঞ্চায়েত নেতৃত্বের কাঠামোতে। ১৯৭৭ সালের পরবর্তী সরকারের আমলে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গো রূপায়িত হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো পঞ্চায়েতের নেতৃত্বের কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় থেকে ধনী এবং মধ্যবিত্ত কৃষকের পরিবর্তে পঞ্চায়েতের নেতৃত্বের কাঠামোতে প্রবেশ ঘটে বর্গাদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষি শ্রমিক, গ্রামের সমাজসেবী, কুটির শিল্পী, বেকার যুবক-যুবতী এবং শিক্ষকদের। রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন সংস্থার তথ্য অনুসারে পঞ্চায়েত স্তরে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষকের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি। গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে বর্তমানে শিক্ষক প্রতিনিধিত্বের হার কিছুটা কমলেও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদে শিক্ষকদের উপস্থিতি যথেষ্ট জোরদার।

তবে এত কিছু সত্ত্বেও বেশ কিছু অন্ধকারময় দিককে অস্বীকার করা যায় না। ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় যে, ১৯৭৭ সালের পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছর যে গতিতে ভূমিসংস্কার হয়েছে তার পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী বাধ্যবাধকতার দরুণ বাম দলগুলো বাধ্য হয়েছিল ভূমিসংস্কার কর্মসূচির গতিতে লাগাম টানতে। তৃতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে দেখা গেছে বামদলগুলির নির্বাচনী বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত কৃষকও বামপন্থীদের সমর্থনের বিনিময়ে নিজের উদ্বৃত্তজমি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

ক্ষেত মজুরদের বৃদ্ধিও গ্রামীণ অর্থনীতির একটা অসুবিধার দিক। আমরা যতই যাই বলি আমাদের দেশের উৎপাদনব্যবস্থা সম্পূর্ণই দাঁড়িয়ে থাকে 'মুনাফার জন্য উৎপাদন' এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে। কলকাতা এবং তার আশেপাশে বন্ধ কারখানা দিনে দিনে বেকার শ্রমিকের সৃষ্টি করছে। অসহায় হয়ে তারা নির্ভর করছে কৃষিক্ষেত্রের উপর। ১৯৯৬-৯৭ সালের ফার্ম ম্যানেজমেন্ট সার্ভে থেকে জানা যায় যে, এই বছর যত শ্রম-দিন কৃষিতে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে ৭৩% হচ্ছে মজুরের শ্রম আর মাত্র বাকি ২৭% হল মালিক পরিবারের শ্রম। সুতরাং নির্ধারিত মজুরি লাভের অংশকে কমিয়ে দেয়, তাই ক্ষেত মজুররা শোষিত হচ্ছে চূড়ান্তভাবে, অথচ কোন উপায় নেই। কারণ সরকার যতই বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা বলুক বাস্তব চিত্রটা অন্য।

একথা ঠিক বর্তমানে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ার ফলে মেয়েরা পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, তাতে তাদের নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটছে। ক্ষীণ হলেও বিভিন্ন কাজে মেয়েদের আজ নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা যায়। নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে বহু গ্রামীণ মেয়েই আজ সক্ষম যার প্রমাণ আমরা সিরাজের 'রেশমির আত্মচরিত'-এর মতন উপন্যাসে পাই। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হয় যে,

(১) কৃষি জমির তুলনায় উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সকল পরিকল্পনার সুফল দিতে পারেনি।

(২) শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারের ফলে কৃষক পরিবারের ছেলে মেয়েরাও স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছে। সেক্ষত্রে এই সমস্ত কৃষক সন্তানেরা আর কৃষিকাজে আগ্রহবোধ করছে না, কারণ গোটা সভ্যতাই আজ নগরায়নের দিকে ঝুঁকে। অথচ তারা পছন্দসই জীবনযাত্রা বা কর্মসংস্থান কোনটাই পাচ্ছে না। ফলে বেকার যুবকদের সংখ্যা বাড়ছে, যারা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা চালিত হচ্ছে। 'জানমারি', 'তখন কুয়াশা ছিল', 'নদীর মতন' এই রকম বহু উপন্যাসে সিরাজ গ্রামবাংলার এই মর্মান্তিক ছবিকে তুলে ধরেছেন। এই কারণেই ৮০ ও ৯০এর দশকে পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো রূপয়াণে পঞ্চায়েতের যে ভূমিকা তার মধ্যে অনেক নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে বলে বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

প্রথমত, ৯০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে যে দলীয়করণ ঘটেছে তাতে সকল সুযোগ সুবিধা বিতরণে দলীয় আনুগত্য অপরিহার্য হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের মানুষ গ্রাম-সংসদ অপেক্ষা দলীয় নেতৃবর্গের কাছে তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েতের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বাড়ছে।

তৃতীয়ত, গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা এখনও স্পষ্ট। বহু ক্ষেত্রে আমলাদের অনীহায় অনেক প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে না।

ক্রমাগত গ্রাম, তার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে এই বিবর্তিত গ্রামবাংলারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। লেখক সিরাজ যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে গ্রামবাংলার ছবি আঁকতে গিয়ে কোনো কল্পনার আশ্রয় নেননি, বরং তার বাস্তব ভিত্তিটা অনেক জোরালো ছিল, সেটা প্রমাণের জন্যই আমার এই অধ্যায়ের অবতারণা।

উৎস নির্দেশ

১. Report of the Team for the study of community projects and National Extension services, planning commission, Govt. of India, New Delhi, 1957.

২. গণশক্তি, ২৮শে মার্চ, ২০০৮